মা হওয়ার দিনগুলোতে

উম্মু হাসান বিনতু সালিম

সম্পাদনা: আরিফ আজাদ

সুকুন পাবলিশিং

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা ৭
সম্পাদকের কথা ৯
অনুবাদকের অনুভূতি ১২
শুরুর কথা ১৪

শুধুই আপনি

অভিনন্দন! ২১
একজন মা হয়ে ওঠা ২৩
মহিমাময়ী মা ২৬
একটি সম্পূর্ণ নতুন দৈহিক অভিজ্ঞতা ৩১
সালাতে উন্নতি সাধন ৩৪
রামাদান ও সিয়াম পালন ৩৯
হজ-উমরা ৪৪
আবেগ সংক্রান্ত পরিবর্তন ৪৬
ধৈর্যধারণ ৫৪
শুকরিয়া জানানো ৫৯
কোথায় আমার কোমর-রেখা! ৬৯
আওরাহ ও দৈহিক আবরণমোচন ৭৩
গর্ভকালীন উদ্বিগ্নতা ৮০
গর্ভকালীন বিষণ্ণতা ৮৯
জীবনের সন্ধিক্ষণে মৃত্যুর ভাবনা ৯৩

স্তন্যপান ৯৬
গর্ভবতী নারীর স্বামীরা ১০০

অনাগত অতিথির জন্য

ভালোবাসা, ভালোবাসি ১১১
আমি তোমাকে শুনতে পাচ্ছি! ১১৩
তার জন্য বদলে যাব ১১৬
বাচ্চার জন্য কুরআন ১১৯
কান সতর্ক রাখব! ১২২
এখনো বেশি দেরি হয়নি ১২৪
১২০ তম বড়ো দিনের গণনা ১২৭
ন্যায়পরায়ণ রুহের জন্য দুআ ১২৮

অপেক্ষার শেষ দিনগুলো

শেষ প্রহরের ভাবনা ১৩৫
জন্ম-পরিকল্পনা ১৩৭
গৃহজন্ম ১৪০
আরও কিছু প্রস্তুতি ১৪২
জন্মদানের সহযোগী ১৪৮
ই.ডি.ডি ১৫১
প্রসবের সময়ে দুআ ১৫৩
কঠিন সময়ের সালাত ১৫৫
ব্যথার উপশম ১৫৭
প্রথম কান্না : শয়তানের ওপর অভিশাপ! ১৬১
নাড়ি ও নাড়িরজ্জু ১৬৪
স্বাগত জানাই তোমায়! ১৬৬
প্রসবোত্তর সময়কাল ১৭০
একটি নতুন জীবনের শুরু ১৭৩

অভিনন্দন!

অভিনন্দন, আপনি মা হতে চলেছেন!

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের দুআগুলো কবুল হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে একটি উত্তম উপহার আমাদের মধ্যে বেড়ে উঠছে। আমাদের অনেকেই প্রথমবার মা হওয়ার এই মধুর স্মৃতিটি পরম যত্নে আগলে রাখেন। এই সময়ে একজন নারী যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যান।

গর্ভাবস্থা কেবল একটি শারীরিক প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি উত্তেজনা, আশংকা, আনন্দ ও বিভিন্ন প্রশ্ন দিয়ে পরিপূর্ণ একটি মনস্তাত্ত্বিক আবেগময় যাত্রা। একজন মায়ের জন্য এই সময়টি বড়ো রকমের মানসিক পরিবর্তন ও প্রস্তুতির সময়। কারণ, এই মুহূর্ত থেকেই মাতৃত্বের জীবনব্যাপী এক যাত্রা শুরু হয়।

মুসলিম এবং অমুসলিম সকল নারীই তাদের নিজ নিজ সন্তানের জন্য সবচেয়ে উত্তম জিনিসই প্রত্যাশা করেন। আমরা প্রত্যেকে জানি যে—মা হওয়া মানে কেবল সন্তানকে সেরা পুশচেয়ার, সুন্দর পোশাক, দুধ কিংবা দামি খেলনা কিনে দেওয়া নয়; বরং একজন নারীর পরিপূর্ণ স্বার্থকতা লুকিয়ে থাকে মা হিসেবে সন্তানের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টার মাঝেই। একজন উত্তম মা হওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে কেবল সন্তানের জন্য একগাদা কেনাকাটা করলে যথেষ্ট হবে না, বরং দুআ, পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টার সম্মিলনে নিজেদের ঢেলে সাজাতে হবে।

নয় মাসের এই বিশেষ সময়টাকে অনেক নারীই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পথে প্রত্যাবর্তনের সুবর্ণ সময় বলে মনে করেন। নিজেদের

আত্মিক পরিশুদ্ধি ও পরিবর্তনের জন্য এই সময়টিতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকি। নিজেদের আচার-আচরণ, বাহ্যিকতা ইত্যাদি নিয়ে খুব সচেতন হয়ে যাই; কারণ, অনাগত নতুন অতিথির প্রথম শিক্ষক হবো আমরাই। তারা আমাদের দেখে অনেককিছু রপ্ত করবে। ব্যাপারগুলো নিয়ে আগে হয়তো কখনো ভাবিনি; কিন্তু যে নতুন সত্তা আমাদের উসিলায় দুনিয়ায় আসতে যাচ্ছে, তাকে সর্বোত্তম পন্থায় বড়ো করতে গেলে এ-সকল আত্মিক প্রস্তুতি আমাদের অবশ্যই থাকতে হবে।

একজন মা হয়ে ওঠা

‘সন্তান ধারণের বিষয়টি আদতে বিশেষ কোনো যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নয়। সন্তানের ভরণপোষণের আর্থিক দায়িত্ব, মানসিক যন্ত্রণা এবং তাদের লালন-পালনের উদ্দেশ্যে পার করা যাবতীয় ঘুমহীন রাত—এ-সব নিয়ে যদি খানিকটা চিন্তা করা হয়, তাহলে আমরা অনেকেই হয়তো সন্তান ধারণের সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসব।’

আপাতদৃষ্টিতে এই উক্তিটি হাস্যকর মনে হলেও দুঃখজনক ব্যাপার হলো, সন্তান জন্মদানের বিষয়ে বর্তমানে বহু নারীর চিন্তাভাবনা ঠিক এ-রকমই। গেনলে তার উক্তির সাথে আরও যুক্ত করেন—

> ‘তাহলে, কেন অধিকাংশ নারীর সিদ্ধান্তকে সকল নারীর পছন্দ বলে চালিয়ে দেওয়া হবে?’

তিনি যদিও একটি মজাদার প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু প্রশ্নটার কোনো উত্তর তিনি দেননি। তিনি জানতে চেয়েছেন—কেন আমরা মা হতে চাই। এই প্রশ্নের সদুত্তর যেহেতু তার কাছে পাওয়া যায়নি, প্রশ্নটা আমরা নিজেরাই নিজেদের করতে পারি।

সন্তান ধারণের ব্যাপারটিকে ‘আমি মা হতে চাই’ না বলে আমরা অধিকাংশই বলি—‘আমি বাচ্চা নিতে চাই’। বাচ্চারা খুবই মিষ্টি ও আদরণীয় হলেও মা হতে চাওয়ার ব্যাপারটি অনেকটাই বিষণ্ণ আর ক্লান্তিকর দায়িত্বে ভরপুর। সম্ভবত, একটি নতুন সত্তাকে নিজের ভেতরে ধারণের বিষয়টি যখন জানতে পারি, তখন থেকেই মা হওয়ার অনুভূতিটা আমরা উপলব্ধি করতে শুরু করি!

'আমরা কেন মা হতে চাই'—এই প্রশ্নটি খুবই আবশ্যকীয়; কেননা, এর সাথে মা হতে চাওয়ার উদ্দেশ্য জড়িয়ে আছে। আর এই প্রশ্নটি তখনই আসে যখন কিনা মা হতে চাওয়ার ব্যাপারটি আমরা প্রথম বারের মতো চিন্তা করি। এই যে মা হতে চাওয়ার ইচ্ছা, এর গুরুত্ব সর্বোচ্চ, কারণ—

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'সমস্ত কাজের ফলাফল নির্ভর করে নিয়ত বা ইচ্ছার ওপর। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে, যা সে ইচ্ছা করে।'[1]

সন্তান নিতে চাওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর গুরুত্ব বিবেচনার জন্য আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসটির ওপর আলোকপাত করতে পারি। সন্তান ধারণের বেলায় যদি আমাদের উদ্দেশ্য উত্তম এবং পবিত্র হয়, তাহলে সন্তানদের সাথে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য আমাদের আমলনামায় সাওয়াব যুক্ত হতে থাকবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনই যদি বাচ্চা নেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ধরে নিতে পারি—আমাদের গর্ভাবস্থা, সন্তান এবং তাদের সাথে কাটানো আমাদের জীবন, সবকিছুই ফলপ্রসূ হবে, ইন শা আল্লাহ। আর মা হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর এই অশেষ রহমত অর্জনের দৃঢ় আস্থাই আমাদের সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এখন তাহলে গেনলের উত্থাপিত প্রশ্নের (কেন অধিকাংশ নারী সন্তান নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে?) উত্তরে আমরা ফিতরাত তথা সহজাত মানব-প্রকৃতির কথা বলতে পারি। মুসলিম হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত করা আমাদের ফিতরাত। উত্তম পরিবার গঠন এবং উত্তম বংশ বৃদ্ধির বাসনাও ফিতরাতের অন্তর্ভুক্ত। সন্তান নেওয়ার কামনা এবং মা হওয়ার ইচ্ছা লালন করাও এক ধরনের ফিতরাত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'নিশ্চয়ই, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।'[2]

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৪

[২] হুবহু এ হাদিস রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়নি। তবে এ হাদিসের ভাবার্থ অন্য আরেকটি সহিহ হাদিসে ফুটে উঠেছে—মুআবিয়া ইবনু জাহিমা সালামি রাহিমাহুল্লাহ

মা হওয়ার সহজাত ইচ্ছাটি খুব সুন্দরভাবে এই হাদিসে উঠে এসেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের বুঝিয়েছেন যে—জীবনের সমস্ত কাজের মধ্যে মাতৃত্ব অত্যধিক মূল্যবান এবং জীবনের উদ্দেশ্যের অখণ্ড অংশ। মা হিসেবে সন্তানের জীবনে একজন নারীর এই ভূমিকা এবং তার প্রতিফল তাকে মাতৃত্বের পরিপূর্ণ স্বাদ এনে দেবে, ইন শা আল্লাহ।

বলেন, আমার পিতা জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। এখন সে ব্যাপারে আপনার কাছে মতামত জানতে এসেছি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন—তোমার মা জীবিত আছে কি? সে বলল—হ্যাঁ, তিনি জীবিত আছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—তার খেদমতে লেগে থাকো। কেননা, জান্নাত তার দুই পায়ের নীচে। সুনানুন নাসায়ি, হাদিস : ৩১০৪

একটি সম্পূর্ণ নতুন দৈহিক অভিজ্ঞতা

গর্ভাবস্থা হলো এমন একটি অভিজ্ঞতা—যার প্রভাব সম্পূর্ণ দেহের ওপরে পড়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে দৈহিক গঠনের তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা না গেলেও গর্ভকালীন কিছু উপসর্গের উপস্থিতি অনেক সন্তানসম্ভবা নারীই টের পেয়ে থাকেন। আর ঘনঘন প্রস্রাবের বেগ এবং সারা দিন ঘুমের আবেশ আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে—আমাদের শরীর তার গতানুগতিক অবস্থায় নেই। গর্ভাকালীন সময়ে আপনাকে স্বাগত!

গর্ভকালীন প্রথম তিন মাসের দৈহিক পরিবর্তনে আমরা অনেকেই অস্থিরতা বোধ করি। এই অস্থিরতার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে আমাদের আমল আর ইবাদাতে। অসুস্থতার কারণে ফরয সালাতের পর ঠিকভাবে কুরআন কারিম তিলাওয়াত করা যায় না। তিলাওয়াত করলেও তাতে ঠিকভাবে মনোযোগ দেওয়া হয় না। সালাতে লম্বা সময় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় কিংবা রুকুতে যাওয়ার জন্য স্থান পরিবর্তনের সময় মাথা ঝিমঝিম করে। সাজদায় থাকা অবস্থায় বমি বমি ভাব হয়। অন্যদিকে, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ঘুমানোর ফলে মাঝে মাঝে সালাতের উপযুক্ত সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়। ওপরন্তু কাজের সক্রিয়তা বেশ কম থাকায় সবকিছু শেষ করতেও অনেকটা সময় লেগে যায়।

দৈনন্দিন জীবনের এই পরিবর্তন দেখে মনে হতে পারে যে, আমরা সময় নষ্ট বা আলসেমি করছি। প্রাপ্তির খাতাও শূন্য মনে হতে পারে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে—এই সময়ে ঠিক এটাই স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। আমরা গর্ভবতী;—এটা আমাদের স্বাভাবিক দৈহিক অবস্থা নয়।

আমরা পুরোপুরি সুস্থও নই। তাই এ সময়ে দেহের চাহিদাগুলো ঠিকভাবে বুঝতে পারা এবং সেই অনুযায়ী সাড়া দেওয়া আমাদের জন্য আবশ্যক। ভুলে গেলে চলবে না, এটা শুধু নিজের খেয়াল রাখার বিষয় নয়, তথাপি আমাদের ভেতর বেড়ে ওঠা একটা ছোট্ট ও নির্ভরশীল সত্তাকে আগলে রাখাও বটে।

এই সময়ে দেহের চাহিদাগুলো সম্পূর্ণরূপে মূল্যায়ন করতে হবে; বিশ্রামের প্রয়োজন হলে বসে কিংবা ঘুমিয়ে শরীরকে বিশ্রাম দিতে হবে। আর খাবারের ব্যাপারে বেছে নিতে হবে আমাদের পছন্দের খাবারটাই। কারণ, এটা হলো সুন্নাহ-সম্মত কাজ। তাই মুরগির মাংসের ঘ্রাণ যদি আমাদের অসুস্থ করে ফেলে, তাহলে সেটা না খাওয়াই উচিত এবং এই খেতে না পারা নিয়ে মন খারাপ করা যাবে না। কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ, সেটা আমাদের শরীরই ভালো বোঝে। তাই সেই অনুযায়ী চলা আমাদের কর্তব্য।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কোনো খাবার খারাপ বলেননি। খাবার পছন্দ হলে খেয়েছেন, আর অপছন্দ হলে কোনোকিছু না বলে সেটা রেখে দিয়েছেন।[1]

একইসাথে মনে রাখতে হবে, আমরা কিন্তু অসুস্থ নই। সুতরাং ইবাদত-আমলের বেলায় কোনোরকম ওজর পেশ করা যাবে না। গর্ভাবস্থা আমল-ইবাদাতের পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়, বরং আমল-ইবাদাত চালিয়ে যাওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ। সালাতের মাধ্যমে মহান আল্লাহকে নিরবচ্ছিন্নভাবে স্মরণ করার জন্য এই নয়টি মাস এক নিয়ামতস্বরূপ। কারণ, এই সময়ে আমাদের ঋতুচক্র সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। তাই কোনোভাবেই একে হেলায় নষ্ট করা যাবে না। দৈহিক সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার পাশাপাশি আত্মিক উন্নতি লাভের জন্য গর্ভকালীন সময় হলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ামত। অতএব, শারীরিক পরিবর্তনের অজুহাতে সালাত পরিত্যাগের কথা চিন্তা করা বোকামি ছাড়া আর কিচ্ছু নয়!

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৫৬৩

গর্ভকালীন সময়টাতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর অপার রহমতের চাদরে আমাদের আগলে রাখেন। অনাগত সন্তানের যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, তাই খাবার-দাবারের বিষয়ে এই সময়ে আমরা কতই না সতর্ক থাকি! কিন্তু সব কিছুর ওপরে আমাদের এটাই মনে রাখতে হবে যে—মহান আল্লাহ-ই হলেন একমাত্র হিফাজতকারী। কাজেই আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার মাধ্যমে আমাদের নিজেদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং গর্ভের সন্তানের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। এই সময়টি মহান আল্লাহকে ভুলে থাকার সময় নয়; বরং আমরা যদি আল্লাহ তাআলাকে মনে রাখি, তবে নিশ্চিত থাকতে পারি যে তিনিও আমাদের মনে রাখবেন। কুরআন কারিমে ঘোষিত হয়েছে—

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ.

সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।[1]

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫২

হজ-উমরা

গর্ভাবস্থা আমাদের জীবনের এমন এক সন্ধিক্ষণ যখন আমরা অনেকেই উত্তম মানুষ ও উত্তম মুসলিমা হওয়ার জন্য মন থেকে দুআ করি। কারণ, এই সময়টায় আমরা একজন মা হয়ে ওঠার যাত্রা আরম্ভ করি। গর্ভকালীন সময়ে নিজের আত্মিক পরিশুদ্ধি, চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং রবের অধিক সান্নিধ্য লাভের তাগাদা যদি প্রবল হয়ে ওঠে মনে, তাহলে সুযোগ থাকলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ঘর, পবিত্র কাবাঘর পরিদর্শনে যাওয়া সবচেয়ে উত্তম। ইহরাম বাঁধা অবস্থায় পবিত্র থাকার যে অনুভূতি, তার সাথে পবিত্র কাবার মহিমা এবং আর-রহমানের অতিথি হিসেবে তার আশপাশে থাকার নিয়ামত আমাদের আত্মশুদ্ধির এক সুনির্মল পথে নিয়ে যায়। আমাদের শরীরে বেড়ে ওঠা নতুন সত্তাটিও যেহেতু নিষ্পাপ, ফলে এই সময়টাতে আল্লাহর পবিত্র ঘর তাওয়াফের মাধ্যমে মাতৃত্ব শুরু করা সুন্দর একটা সুযোগ বটে! আর, আমরা তো জানি হজ এবং উমরার কী দুর্দান্ত ফজিলত!

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> ‘একটি উমরা পরবর্তী উমরা পর্যন্ত মাঝখানের গুনাহসমূহের কাফফারাস্বরূপ এবং ত্রুটিমুক্ত (অথবা আল্লাহর নিকট গৃহীত) হজের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।’[1]

যদিও গর্ভাবস্থার সময়টি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ঘর পরিদর্শনে যাওয়ার জন্য খুবই চমৎকার একটা সময়, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৭৭৩

পূর্বে কিছু জিনিস মাথায় রাখা জরুরি। হজ একটি আধ্যাত্মিক, মানসিক, ও শারীরিক সফর—যা প্রচুর সংখ্যক মানুষের সাথে দলবদ্ধভাবে করা হয়। তাই পরিপূর্ণ গর্ভাবস্থায় বা গর্ভকালীন সময়ের প্রথম দিকে অথবা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় হজের সফর করা একদমই উপযুক্ত নয়। এমনকি গর্ভকালীন সময়টাতে যদি আমরা কোনোরকম শারীরিক অসুস্থতা অনুভব না-ও করি, তথাপি এই সময়টায় হজ বা উমরাহ করতে যাওয়ার ব্যাপারে বারংবার ভাবা উচিত এবং সতর্ক থাকা উচিত। বাড়িতে থাকা অবস্থায় যে সকল চিকিৎসাসেবা সহজে পাওয়া সম্ভব, সফরকালীন সময়ে সেটা সহজলভ্য না-ও হতে পারে। বাড়তি সতর্কতার লক্ষ্যে কিছু কিছু দেশ, যেমন মালয়েশিয়া, গর্ভবতী নারীদের হজ পালনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

তাই গর্ভকালীন সময়ে হজ কিংবা উমরাহ সফরের বিষয়ে চিকিৎসকের সাথে নিজের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা নিয়ে খোলাখুলি আলাপ করে নিলেই ভালো। এতে উত্তম পরামর্শ গ্রহণে সুবিধে হবে।

শুকরিয়া জানানো

আমাদের জীবনে যা কিছু আছে, সব কিছুর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে শুকরিয়া জানানোর যতগুলো উত্তম সময় আছে তার একটি হলো গর্ভকালীন সময়। স্বাভাবিক সময়ে যে-সব নিয়ামত আমরা নিশ্চিন্তে ভোগ করে থাকি তার সবকিছুই আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে পাওয়া একেকটি রহমত। ওই মুহূর্তে আমরা হয়তো ব্যাপারটা সেভাবে উপলব্ধি করতে পারি না, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া নিয়ামতের যদি তালিকা করা হয়, তাহলে তা গুনে শেষ করা যাবে না। তবে গর্ভাকালীন সময়ে আল্লাহর দেওয়া প্রতিটি নিয়ামত আমরা খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি। তাই এই সময়টা আমরা বেছে নিতে পারি নিজেদের মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধ অর্জনের মাধ্যম হিসেবে; কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন—

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ
كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.

স্মরণ করো, যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য (আমার নিয়ামত) বৃদ্ধি করে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও (তবে জেনে রাখো, অকৃতজ্ঞদের জন্য) আমার শাস্তি অবশ্যই কঠিন।[1]

[১] সূরা ইবরাহিম ১৪ : ৭

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এত দয়াময় রব যে, তিনি নিজের অনুগ্রহে আমাদের তাঁর নিয়ামতরাজির মাঝে ডুবিয়ে রেখেছেন। তারপরও, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সেসব নিয়ামতরাজি পাওয়ার পরে যখন আমরা কৃতজ্ঞ হই, তখন সেসব নিয়ামত তিনি আরও বাড়িয়ে দেন। দুনিয়াতে কত মানুষ কত ধরনের পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অনুগ্রহ করে আমাদের বড়ো কোনো পরীক্ষার মুখোমুখি করেননি। কত মানুষের ঘরে পরের বেলা রান্না করার মতো চাল নেই; কিন্তু আমাদের তিনি কত আরাম-আয়েশে রেখেছেন। কত মানুষের জীবন কেটে যাচ্ছে হাসপাতালের বিছানায় কাতরাতে কাতরাতে; কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, কত সুস্থ-স্বাভাবিক আমরা। কারও ঘরে শান্তি নেই, দাম্পত্য-জীবনে সুখ নেই, কোলজুড়ে সন্তান নেই; কিন্তু আল্লাহর অপার দয়া আর রহমতে আমাদের অনেকের জীবনে হয়তো সেই দুঃখগুলোর আঁচড় লাগেনি। আল্লাহর রহমতে আমাদের জীবনের এই যে অঢেল সুখ, শান্তি আর নিরাপত্তা, এসবের জন্যে কি আমরা কখনো তাঁর প্রতি সেভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি? কখনো কি দুই রাকাআত অতিরিক্ত সালাত আদায় করেছি শুধু সাজদায় গিয়ে মন ভরে তাঁর দেওয়া নিয়ামতের কথা স্মরণ করে অশ্রু ঝরাবো বলে?

হয়তোবা করেছি, হয়তোবা করিনি। গর্ভাবস্থার সময়টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য খুবই উত্তম একটা সময়। গর্ভাবস্থায় আল্লাহর রহমত আমরা গভীরভাবে অনুভব করি এবং আমাদের মন এই সময়ে আবেগে পরিপূর্ণ থাকে। তাই এই সময়টাতে আমরা নানানভাবে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি।

প্রথমত, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রদত্ত নিয়ামতগুলো মনে মনে হিসেব করা। যদিও আল্লাহর নিয়ামতরাজি গুনে শেষ করা সম্ভব নয়, তথাপি যতটা সম্ভব নিজের জীবনে পাওয়া আল্লাহর রহমত এবং বরকতগুলো স্মরণে আনতে পারলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মুহূর্তটা আরও আনন্দময় হয়ে উঠবে। প্রতি ওয়াক্ত সালাতের পর একাগ্রচিত্তে আল্লাহ

তাআলার নিয়ামতের স্মরণে ‘সুবহানআল্লাহ’, ‘আলহামদুলিল্লাহ’, ‘আল্লাহু আকবার’—এই তাসবিহগুলো পাঠ করা।

দ্বিতীয়ত, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্যতম একটা উপায় হলো সর্বদা নিজের অবস্থান নিয়ে ভাবা। দুইটি এমন বৈশিষ্ট্য আছে, যা কোনো ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া গেলে আল্লাহ তাআলা ‘কৃতজ্ঞ’ ও ‘ধৈর্যশীল’ বান্দা হিসেবে তার নাম লিখে রাখবেন—

- প্রথমটি হলো—একজন ব্যক্তি দ্বীনের বিষয়ে তার থেকে এগিয়ে থাকা ব্যক্তির দিকে তাকাবে এবং তার মতো হওয়ার চেষ্টা করবে।
- দ্বিতীয়টি হলো—দুনিয়ার বিষয়ে সে তার নীচের অবস্থানে থাকা ব্যক্তির দিকে তাকাবে এবং আল্লাহর প্রশংসা করবে সকল নিয়ামতের জন্য।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—তোমাদের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকেদের প্রতি দৃষ্টি দাও। তবে তোমাদের চেয়ে উঁচু স্তরের লোকেদের দিকে লক্ষ্য করো না। কেননা, আল্লাহর নিয়ামতকে তুচ্ছ না ভাবার এটাই উত্তম পন্থা।[1]

কার কত বড়ো বাড়ি আছে, কার বাড়ির আঙিনা কত বিশাল, কার স্বামীর কাড়ি কাড়ি আয়-উপার্জন, কারা প্রতি মাসে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করতে যায় ইত্যাদি দেখে যদি আমরা হাপিত্যেশ করি এবং সেগুলো লাভের তাড়না অনুভব করি, দিনশেষে এই অনুভূতি আমাদের অন্তরে হাহাকার ছাড়া আর কোনোকিছুই দিতে পারবে না। এসব তাড়না আমাদের জীবনে থাকা নিয়ামতের ব্যাপারে আমাদের অসন্তুষ্ট করে তোলে। আমাদের মাথার ওপরে একটা ছাদ আছে, আমরা শারীরিকভাবে সুস্থ, আমাদের ঘরে পর্যাপ্ত খাবার আছে, আমাদের স্বামীদের ভালো একটা চাকরি আছে, আমাদের সন্তানেরা অনুগত—এই সমস্ত নিয়ামত একজীবনে কম কিছু কি? আমাদের যা-কিছু আছে শুধু ওইটুকু লাভ করাই দুনিয়ার কত কত মানুষের

[১] জামি তিরমিজি, হাদিস : ২৯৬৩

একজীবনের স্বপ্ন। আমরা যদি দুনিয়ার সম্পদ লাভে অগ্রগামী ব্যক্তির সাথে প্রতিযোগিতায় নামি তা দিনশেষে হতাশা ছাড়া আর কোনোকিছুই আমাদের দিতে পারবে না। আমাদের তাকানো উচিত যাদের জীবন আমাদের চেয়ে কম স্বাচ্ছন্দ্যের, কম আরাম-আয়েশের। তাহলে আমরা নিজেদের জীবনে প্রাপ্ত নিয়ামতের মর্যাদা অনুধাবন করতে পারব এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতিও কৃতজ্ঞ হতে পারব।

কিন্তু অপরদিকে, আমাদের চারপাশে কত লোক আছেন যারা নিয়মিত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করেন। সঠিক সময়ে আদায় করেন প্রতিদিনের সালাত। অনেকে আছেন যারা অবারিত দান-সাদাকা করেন। উত্তম আখলাক, উত্তম চরিত্র গঠনের জন্য অনেক মানুষ আমাদের চারপাশে প্রশংসিত হয়। অনেকে নিয়ম করে কুরআন কারিম হিফজ করেন। কেউ কেউ ইমাম নববির চল্লিশ হাদিস আত্মস্থ করার জন্য ব্যস্ততার মাঝেও সময় বের করেন। এই মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে আমাদের উচিত নিজেদের অবস্থা ঝালাই করে নেওয়া। তাদের অনুকরণ করা, তাদের মতো আমল-ইবাদাত করা, তাদের মতো উত্তম আখলাক-উত্তম চরিত্র গঠনের চেষ্টা করা।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে এগিয়ে থাকা লোকজনের দিকে তাকালে নিজের অবস্থান ভেবে হৃদয়ে যে শূন্যতা তৈরি হয় সেটা আমাদের জন্য উপকারী। এই শূন্যতা আমাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছ থেকে দূরে সরায় না, বরং আরও আর কাছাকাছি নিয়ে আসে।

তৃতীয়ত, সব সময় 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতে পারা হৃদয়ের গভীর থেকে আল্লাহর রহমত উপলব্ধি করতে শেখায়। আমরা যদি প্রতিদিনকার ঘুম থেকে ওঠা, খাবার খাওয়া, কোনোকিছু লাভ করা ইত্যাদি দুআগুলোর অনুবাদ পড়ি, তাহলে দেখব—সেগুলোর অনেকটাজুড়ে আল্লাহর প্রশংসা বিদ্যমান। দুআগুলোর অর্থ অনুধাবন করে আমরা নিয়মিতভাবে সেগুলো করতে পারি। আমাদের দেখাদেখি আমাদের সন্তানেরাও দুআগুলোতে অভ্যস্ত হবে এবং তারাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ

হওয়ার রসদ খুঁজে পাবে। উদাহরণ হিসেবে কাপড় পরিধানের দুআটি দেখা যাক। নিজের কাপড় পরিধানের সময় অথবা সন্তানকে পরানোর সময় আমরা বলতে পারি—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلاَ قُوَّةٍ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাকে (কাপড়) পরালেন এবং তা আমাকে দান করেছেন আমার পক্ষ থেকে পাওয়ার কোনো শক্তি-সামর্থ্য ছাড়াই।[1]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রশংসাবাচক এই দুআগুলোর অন্যতম কার্যকারিতা হলো এই—এসব দুআ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওপরে আমরা কতখানি নির্ভরশীল। তাঁর দয়া, রহমত আর করুণা ছাড়া আমাদের যে কিচ্ছু করার ক্ষমতা নেই সেই বিষয়টি নিত্যদিনের এই দুআগুলো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এই দুআগুলো নিয়মিত পাঠের চর্চা একদিকে যেমন সুন্নাহর সাথে আমাদের বন্ধন দৃঢ় করে তোলে। অন্যদিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার স্মরণে অন্তর সর্বদা ব্যাপৃত রাখার কাজও হয়ে যায়।

চতুর্থত, আমাদের উচিত সবসময় শেকড়ের কথা স্মরণ রাখা এবং এটাও মনে রাখা যে—প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের হিফাজত করছেন। আর আমাদের বর্তমান অবস্থান, অর্থাৎ আমাদের গর্ভাবস্থাও তাঁর রহমতেরই অংশ। কুরআন কারিমে ঘোষিত হয়েছে—

وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

[১] আবু দাউদ, হাদিস : ৪০২৩

> আল্লাহ তোমাদের মায়ের পেট থেকে তোমাদের বের করেন, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের শোনার শক্তি, দেখার শক্তি আর অন্তর দান করেছেন, যাতে তোমরা শোকর আদায় করতে পার।[1]

মাতৃগর্ভে সন্তান ধারণ মহান রবের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি! একদলা মাংসপিণ্ডের মধ্যে জীবন দান, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও আবেগ সঞ্চালন করা—ব্যাপারগুলো কী ভীষণ অলৌকিক! এই অলৌকিক বিষয়গুলো কত সহজ, সাবলীল আর নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে থাকে আমাদের গর্ভে—সুবহানাল্লাহ! একজন সন্তানসম্ভবা নারীর জন্য এই বিষয়টা উপলব্ধি করা অন্যদের চাইতে অনেক বেশি সহজ। তাই, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই বিস্ময়কর সৃষ্টি-কারুকার্যের কথা স্মরণ করে, প্রতিনিয়ত সেটা উপলব্ধি করার মাধ্যমে আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারি। যত বেশি আমরা আল্লাহর সৃষ্টিকার্যের নিপুণতা নিয়ে চিন্তা করব, আমাদের হৃদয়-মন তত বেশি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় নুইয়ে আসবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই যে আমাদের শেকড়, একদা আমাদেরও যে তিনি মাতৃগর্ভে এভাবে বড়ো করেছেন—সেটা আমরা ভীষণভাবে অনুভব করতে পারব।

পঞ্চমত, আমাদের সব সময় মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। আমাদের চারপাশের মানুষজনের ওপর আমরা ভীষণভাবে নির্ভরশীল। আমাদের বাবা-মা, ভাই-বোনের ওপর। আমাদের স্বামী-সন্তান-শ্বশুর শাশুড়ির ওপর। আমাদের পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়স্বজন—সকলে আমাদের কোনো-না-কোনো উপকারে আসেই। তাই মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা বড়ো একটা দায়িত্ব। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'যে লোক মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।'[2]

---

[১] সূরা নাহল, আয়াত : ৭৮

[২] সুনানু আবি দাউদ, হাদিস : ১৯৫৪

মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকলে সম্পর্কের উন্নতি সাধন হয়। পারস্পরিক সৌহার্দ্য বাড়ে। এতে করে ব্যক্তির পাশাপাশি সমাজও উপকৃত হয়। একটা সমাজের মানুষ যত বেশি একতার মাঝে থাকে, সেই সমাজ তত বেশি সুন্দর আর কল্যাণকর হয়ে ওঠে।

মোটকথা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে ওঠার জন্য আমাদের অনেক বেশি দুআ করতে হবে। দুআর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে তাউফিক চাইতে হবে; যেন আমরা সদাসর্বদা আল্লাহ তাআলার নিয়ামতরাজির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি, মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারি।

একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট্ট সাহাবি মুআজ ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে ধরে বললেন—

> ‘মুআজ, আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে ভালোবাসি! আর শোনো, প্রতি সালাতের শেষে এই দুআটা পড়তে কখনোই ভুলবে না—

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ভালোবাসার কথা জানিয়ে দিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি জিনিসের ব্যাপারে প্রতি সালাতে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে বলেছেন। সেগুলো হলো—

- আল্লাহকে স্মরণ করা,
- আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া, এবং
- অতি-উত্তমভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে পারা।

কুরআন কারিমের এই আয়াতের সাথে কী সুন্দরভাবে মিলে যায় এই দুআটি—

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

> অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব এবং তোমরা আমারই নিকট কৃতজ্ঞ হও আর অবিশ্বাসী হয়ো না।'[1]

আমরা যদি আল্লাহকে স্মরণ করি, আল্লাহও আমাদের স্মরণ করবেন অর্থাৎ আমাদের প্রতি তাঁর খেয়াল বাড়িয়ে দেবেন। এ-জন্যেই মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে স্মরণের ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য চাইতে বলেছেন। আমরা যদি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হই, তিনি তাঁর দয়া আর বরকত আমাদের জন্য আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন। এ-জন্যই মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেওয়া নবীজির দ্বিতীয় উপদেশেই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার জন্য সাহায্য চাইতে বলা হয়েছে। উপরের আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন—আমরা যেন অবিশ্বাসী হয়ে না পড়ি। উত্তমরূপে আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করতে পারলে অন্তর কুফর আর শিরকের অন্ধকার থেকে মুক্তি লাভ করে। তাই মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য নবীজির তৃতীয় উপদেশে উত্তমভাবে ইবাদাতের কথা উঠে এসেছে।

গর্ভাবস্থা এবং গর্ভাবস্থার বাইরের স্বাভাবিক সময়ে মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শিখিয়ে দেওয়া নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই দুআটি আমরা প্রতি ওয়াক্তের সালাতে পড়ার অভ্যাস করতে পারি। এই দুআ আল্লাহকে স্মরণ করতে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে এবং উত্তমভাবে তাঁর ইবাদাত করতে আমাদের জন্য সবিশেষ উপকারী হয়ে উঠবে, ইন শা আল্লাহ।

একজন গর্ভবতী নারী হিসেবে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে—সন্তানধারণ নিছক কোনো ঘটনা নয়, বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিশেষ রহমত। আমাদের পছন্দ করেন বলেই এই নিয়ামত ধারণের সুযোগ দিয়েছেন। চারপাশে কত কত নারী আছে যারা আকুলভাবে একজন সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা লালন করে মনে; কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫২

ওয়া তাআলা চান না বলে তারা সেই সুযোগটা পায় না। কুরআন কারিমে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন—

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذُّكُورَ - أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

> ‘আসমান ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহরই, তিনি যা চান তা-ই সৃষ্টি করেন। যাকে চান তিনি কন্যা-সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা দান করেন পুত্র-সন্তান। অথবা তাদের দেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আর যাকে ইচ্ছে বন্ধ্যা করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বাধিক অবহিত ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।’[1]

আমাদের অনেকেই একটা সন্তান লাভের জন্য বহু বছর ধরে প্রতীক্ষায় আছি, কিন্তু আমাদের কোল আলো করে কোনো সন্তান আসছে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রিয় রাসুল, যাকে তিনি ‘খলিল’ তথা ‘বন্ধু’ বলে উল্লেখ করেছেন, সেই ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে তিনি বহু বছরের প্রতীক্ষার পরে সন্তান দান করেছিলেন। তার স্ত্রী সারাহ যখন ইসহাক আলাইহিস সালামকে গর্ভে ধারণ করেন, তখন তার বয়স প্রায় সত্তর। কুরআন থেকে আমরা জাকারিয়া আলাইহিস সালামের কথাও জানতে পারি, যিনি একজন সন্তানলাভের জন্য আল্লাহর দরবারে আকুলভাবে দুআ করেছিলেন। বলছিলেন—

> ‘আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গিয়েছে এবং বার্ধক্যের কারণে সাদা হয়ে গিয়েছে আমার মাথার চুলও। আর, আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা।’[2]

নিজের অবস্থা আল্লাহর সামনে এভাবে তুলে ধরার পরে তিনি আল্লাহর কাছে একটা সন্তান লাভের আশা ব্যক্ত করেন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার দুআ কবুলও করেন। সুবহানাল্লাহ! এত দীর্ঘ সময় নিঃসন্তান

[১] সূরা আশ-শূরা, আয়াত : ৪৯-৫০
[২] সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৩-৫

ভালোবাসা, ভালোবাসি

হাত এবং পায়ের ছোটো ছোটো আঙুল। বোতামের মতো ছোট্ট একটা নাক। তুলতুলে গা। চোখ দুটো পিটপিট করে তাকাবে সে। আচ্ছা, সে কি আমার মতো দেখতে হবে নাকি তার বাবার মতো?

আমাদের সন্তান কার মতো দেখতে হবে সেটা আমরা কল্পনা করি। যেদিন তার জন্ম হবে, সেদিন তাকে কোলে নেওয়ার মুহূর্তটা কেমন হবে, সেটা চিন্তা করি। আলতোভাবে, স্নেহের সাথে পেটে হাত বুলিয়ে এই অদৃশ্য সত্তার সাথে কথা বলি, যাকে আমরা ইতিমধ্যে ভালোবেসে ফেলেছি। আমাদের ভেতর বেড়ে ওঠা এই নতুন জীবনের জন্য আমরা সকল অসুস্থতা ও ব্যথা সহ্য করি। কারণ, সে আমাদের সন্তান।

অনাগত সন্তানের প্রতি আমাদের এই আসক্তির নামই বন্ধন। এ বন্ধন সময়ের সাথে সাথে আরও শক্তিশালী ও গভীর হয়। সন্তানের কাছ থেকে অনেক অনুভূতি, অনেক জীবনবোধ আমরা শিখি এবং এই প্রক্রিয়া সে গর্ভে থাকাবস্থায়-ই শুরু হয়।

অদেখা সন্তানকে গভীরভাবে ভালোবাসার ও অনুভব করার বিষয়টি আমাদের সামনে আরও একটা জিনিসকে খোলাসা করে দেয়, আর তা হলো, আমাদের জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভালোবাসা, এবং নবীজির জন্য আমাদের ভালোবাসা। নবীজি কিন্তু আমাদের দেখেননি। আমরা কেমন, কী আমাদের গায়ের রঙ, কী আমাদের পছন্দ-অপছন্দ—তার কোনোকিছুই তিনি জানতেন না। তবুও সেই কত আগে—সাড়ে চৌদ্দ'শ বছর পূর্বের পৃথিবীতে বসে তিনি অকাতরে আমাদের জন্য ভালোবাসা বিলিয়ে গেছেন। তাঁর উম্মতের জন্য দুআ করে গেছেন,

তাদের জন্য বাতলে দিয়ে গেছেন সর্বোত্তম জীবনপদ্ধতি। আবার, আমরাও কিন্তু নবীজিকে দেখিনি কেউ। তারপরেও তাঁকে মনপ্রাণ উজাড় করে ভালোবাসি। এই যে না দেখে নবীজিকে ভালোবাসার নমুনা, আমাদের অনাগত সন্তানেরা সেটা আমাদের নতুন করে অনুভব করিয়ে যায়।

অনাগত সন্তানের জন্য পুষে রাখা ভালোবাসা এবং তার সার্বিক কল্যাণ-চিন্তা মাঝে মাঝে রূপ নিতে পারে ভয় আর উদ্বেগে। তাদের সুস্থতা, শারীরিক-মানসিক-আত্মিক বিকাশ, এবং সর্বোত সুখী জীবনের জন্য আমরা সর্বদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দুআ করতে থাকব। ফুলের মতো সুন্দর যেন হয় তাদের চরিত্র। যেন কুসুম-কোমল হৃদয়ের অধিকারী হয়ে, মহান রবের সন্তুষ্টি অর্জন করে আখিরাতে আমাদের জন্য নাজাতের উসিলা হতে পারে—মা হিসেবে এই দুআ জারি রাখা অবশ্য কর্তব্য।

সন্তানদের নিজস্ব জগতের ভিত্তি স্থাপনের কাজটা আমাদেরই করতে হবে। তাদের যদি মহীরুহ হিসেবে দেখতে চাই, চারাগাছ থাকাবস্থায় পর্যাপ্ত যত্নটা তো করতেই হবে। তারা দুনিয়ায় এসে প্রথম শ্বাস নেওয়ার বহু আগে থেকেই আমরা তাদের জীবনের ভিত্তি স্থাপনের প্রস্তুতি নিতে থাকি। এভাবেই গর্ভকালীন সময়টি হয়ে ওঠে একটু সম্মিলিত প্রচেষ্টা পর্ব।

আমি তোমাকে শুনতে পাচ্ছি!

আমাদের ট্রাউজারের ইলাস্টিক একটু একটু করে অস্বস্তিকর লাগা শুরু করেছে এবং তা সত্ত্বেও আমাদের মুখ কিন্তু হাসি হাসি। একটা অবাধ খুশির ফোয়ারা যেন আমাদের দেহ-মনে ছড়িয়ে পড়েছে। গর্ভাবস্থার এই পর্যায়ে এসে আমরা বুঝতে পারি যে—অদেখা এক নতুন অতিথি এখন আমাদের চারপাশের আওয়াজ শুনতে পায়। কী দারুণ ব্যাপার! আমাদের কথা, আমাদের দৈনন্দিন কাজের টুংটাং শব্দও সে শুনে ফেলে। মনে পড়তেই আমরা যেন খিলখিল করে হেসে ফেলি।

আমরা তাকে গান শোনাই, ছড়া শোনাই, তিলাওয়াত শোনাই। সোনা-মানিক ছাড়াও আরও কত আদুরে শব্দ দিয়ে তাকে ডাকি। সে জবাব দেয় না, কিন্তু জেগে থাকলে ঠিকই শোনে এসব। তার কি ইচ্ছে করে জবাব দিতে? তার মুখ কি নড়াচড়া করে? চোখ মেলে সে কি তাকায়? কত কত প্রশ্ন যে মনে জাগে—তার ইয়ত্তা নেই। তার এই অদৃশ্য উপস্থিতির মাধ্যমে সে হয়ে ওঠে আমাদের জগতের অংশ।

দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক, অর্থাৎ গর্ভে সন্তানের বয়স চার মাস হওয়ার পর থেকেই কিন্তু তারা আমাদের শুনতে পায়। এতদিন তারা ছিল আমাদের দেহের অংশ। আমাদের টেনে নেওয়া অক্সিজেন ছিল তাদের নিঃশ্বাসের সম্বল। আমাদের গ্রহণ করা খাদ্যই ছিল তাদের খাবারের উৎস। কিন্তু আজ থেকে সেই যাত্রায় যোগ হলো নতুন কিছু। আজ থেকে সে আমাদের শুনতেও পায়। আমাদের আদরমাখা ডাক, স্নেহ-মাখা স্বর পৌঁছে যায় তার কর্ণকুহরে!

গর্ভাবস্থার প্রথম মাসেই বাচ্চাদের কান গঠিত হতে শুরু করে। তবে পুরোপুরি গঠন হওয়ার পূর্বেই তারা সব শুনতে ও সাড়া দিতে পারে। গর্ভাবস্থার অষ্টম সপ্তাহে বাচ্চা শ্রবণ করার শক্তি লাভ করে। বিশতম সপ্তাহে গিয়ে সেটা পূর্ণ হয় এবং চব্বিশতম সপ্তাহে গিয়ে সে সক্রিয়ভাবে শ্রবণশক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়। এই সময়কালে সে রান্নাঘরে আমাদের কাজ করার শব্দ, ফ্রিজ খোলার শব্দ কিংবা স্বামীর সাথে করা খোশগল্পের শব্দ—সমস্তকিছুই সে শুনতে পায়। আট মাসের মধ্যেই তাদের সেই শ্রবণশক্তি স্বাভাবিক মানুষের শ্রবণশক্তির পর্যায়ে পৌঁছায় এবং তখন তারা সবকিছু স্বাভাবিক মানুষের মতো করেই শোনে—মায়ের পেটে থাকতেই।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যজনক তথ্য হলো—বাচ্চারা মায়ের কণ্ঠই বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনে থাকে। কানাডার ওন্টারিও-র 'কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়'-এর বারবারা কিসিলেভ্সকি বলেন—

> 'মায়ের কণ্ঠস্বর শুনে গর্ভের বাচ্চারা বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই কণ্ঠটাই তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি পরিচিত এবং আপন।'

শুধু তা-ই নয়, জন্মের পরও তারা মায়ের কণ্ঠস্বর মনে রেখে দেয় এবং কণ্ঠস্বর শুনে ঠিক ঠিক বুঝে নেয় কোনজন তার মা। অনেক নবজাতকের বেলায় খুব স্বাভাবিক ঘটনা এটা। দেখা যায় জন্মের পর সে এতবেশি কান্নাকাটি করছে যে কেউ তাকে কোনোভাবে থামাতেই পারছে না। তারপর মায়ের কোলে যখন দেওয়া হয়, মা যখন উষ্ণ আলিঙ্গনে তাকে বুকে টেনে নেয় এবং আদুরে গলায় ডাকে, তখন তার গগনবিদারি চিৎকার মুহূর্তেই থেমে যায়। মায়ের উষ্ণতা এবং কণ্ঠস্বর সে গর্ভে থাকতেই চিনে এসেছে এবং মনে রেখে দিয়েছে।

আরও একটা বিষয় এই সময় লক্ষ করা যায়। গর্ভে থাকাকালীন বাচ্চারা যে সকল শব্দ নিয়মিত শোনে, সেই শব্দের প্রতি 'সাড়া' দেওয়ার মতো একপ্রকারের আচরণ তাদের মাঝে গড়ে ওঠে। ধরা যাক কোনো গর্ভবতী নারী অত্যধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করেন। জন্মের পর দেখা যাবে, কুরআনের তিলাওয়াত শুনলে বাচ্চাটা শান্ত হয় অথবা সাড়া দেয়।

কেউ যদি অত্যধিক জিকির-আজকার করে, সন্তানও সেটা শুনলে সাড়া দিতে থাকবে।

শুধু মায়ের কণ্ঠস্বর চিনতে পারাই নয়, মায়ের আবেগ দ্বারাও তাড়িত হতে পারে গর্ভের সন্তান। গর্ভাবস্থায় আমরা যখন কোনো অনুভূতির ভেতর দিয়ে যাই, তখন আমাদের মধ্যে একধরনের এনজাইম তৈরি হয়। খুব সম্ভাবনা থাকে—এই এনজাইম নাড়ির মাধ্যমে গর্ভের সন্তানের মাঝেও সঞ্চালিত হওয়ার। ফলে, গর্ভাবস্থায় যদি আমরা সর্বদা রেগেমেগে অস্থির থাকি, খিটখিটে হয়ে থাকি এবং অগোছালো জীবনযাপন করি, আমাদের এই আচরণের প্রভাব সন্তানের মাঝে ছড়িয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আবার, আমরা যখন আমাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করব, যে-কোনো কিছুতে রেগে অস্থির না হবো, ধৈর্যধারণ করব, আমাদের সন্তানও সেই আচরণ রপ্ত করবে।

চোখ ঝলসে দেওয়া আলো নেই—এমন একটা ঘরে বসে ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে পারি। তারপর কুরআন কারিমের কিছু প্রিয় অংশ বারংবার তিলাওয়াত করতে পারি এবং সেই সাথে হাত বুলাতে পারি পেটে। যদি সন্তান নড়েচড়ে ওঠে, তাহলে কাজটা প্রতিদিন নিয়ম করে চালিয়ে নিতে পারি। সন্তান যদি এতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, জন্মের পর তাকে শান্ত করতে বাবা-মা'র খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। সে অবিশ্রান্তভাবে কান্নাকাটি শুরু করলে আমরা কুরআন কারিম তিলাওয়াত শুরু করতে পারি। এতে সে শান্ত হবে, যেমনটা হতো গর্ভে থাকতে। বাচ্চাকে শান্ত করার জন্য পরিচিত শব্দ ব্যবহার করার পেছনে যুক্তি হলো, যা কিছু তাদের গর্ভে থাকাকালীন আরামদায়ক সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, জন্মগ্রহণ করার পর সেই একই বিষয়গুলো তাদের জন্য সান্ত্বনার মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। এই জন্যই বাচ্চাকে বুকের কাছে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখলে তারা শান্ত হয় কারণ মায়ের গর্ভে তাদের বেশ আঁটসাঁটভাবে থাকতে হয়েছে। মায়ের হৃদস্পন্দন শুনতে শুনতে তারা অভ্যস্ত।